জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশ্ববাসী দুইটি বড় যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলমান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ২ কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সভ্যতার আলোয় আলোকিত অনেক শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। যুদ্ধের এই ভয়াবহতা বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয় এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২০ সালের ২০ জানুয়ারি গঠিত হয় জাতিসংঘ। পরবর্তীকালে বিশ্বরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ব্যাপক পরিবর্তন, বৃহৎ শক্তির স্বার্থপরতা, সাংগঠনিক দুর্বলতাসহ নানাবিধ কারণে জাতিসংঘ তার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথমটির চেয়েও ধ্বংসাত্মক ছিল। ৮ বছরব্যাপী চলা এই যুদ্ধে প্রায় ৯ কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটে। পৃথিবীর উন্নত ও সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত শহরগুলো ধুলোয় মিশে যায়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক হামলার দরুন সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দেয়। বিশ্বনেতারা অনুভব করেন এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে মানবসভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।

বিশ্বরাজনীতির এমন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর মাত্র ৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে যাত্রা শুরু হয় জাতিসংঘ নামের এই আন্তর্জাতিক সংস্থার। জাতিসংঘের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্যসংখ্যা ১৯৩টি, যা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও

নিরাপত্তা বজায় রাখতে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১১টি জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন চলমান রয়েছে।

জাতিসংঘের প্রথম শান্তি মিশন শুরু হয় ১৯৪৮ সালের মে মাসে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংঘটিত প্রথম আরব-ইসরাইল যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ ইউনাইটেড নেশনস ট্রুস সুপারভিশন অর্গানাইজেশন (UNTSO) নামে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে যুদ্ধের কাজ ছিল মূলত যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করা। এছাড়াও তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রেরণসহ অন্যান্য মিশনকে সহায়তা করাও এই মিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটা মূলত কোনো যুদ্ধ ফোর্স ছিল না, বরং পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা ছিল এর মূখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদান করে ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে। ইরাক-ইরান সীমান্তে পরিচালিত UNIIMO-এ মিশন ১৫ জন সেনা পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘ শান্তি মিশনে তাদের গৌরবোজ্জ্বল পথযাত্রা শুরু করে। এটা ছিল সীমিত পরিসরের জাতিসংঘের শান্তি মিশন বাংলাদেশের অংশগ্রহণ। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে আফ্রিকার দেশ নামিবিয়ায় পরিচালিত শান্তি মিশন 'আনট্যা' বা 'ইউনাইটেড নেশনস ট্রানজিশন এসিস্ট্যান্স' গ্রুপে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য নামিবিয়া মিশন ছিল একটা বিশাল মাইলফলক। ১৯৮৯-১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলমান এই মিশন ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বড় মাপের কোনো সফল মিশন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রম ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও পেশাদারিত্বের জন্য ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ায় একটি সফল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে প্রায় ৪২ বছর নামিবিয়া শত্রুশূণ্য নিরাপদে দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাবাহিনী

ও স্থানীয় বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটে। এই মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীদের নাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

সততা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি সম্মানবোধ, পেশাদারিত্ব ও শৃঙ্খলার জন্য জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তিরক্ষা মিশনের আইকন হয়ে ওঠে। তখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৫৮টির অধিক জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করে। সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনা সরবরাহ করার গৌরব অর্জন করে বেশ কয়েকবার।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জিং মিশনে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত উন্নত মানের পেশাদারিত্বের পরিচয় দেয়। কঙ্গোর কঙ্গোতে অনুষ্ঠিত মধ্যস্থতা শান্তি মিশন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অন্যতম দীর্ঘ এবং কঠিন একটি মিশন। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই মিশনে অংশগ্রহণ করে। কঙ্গোতে প্রায় শতাধিক সশস্ত্র গ্রুপ বিদ্যমান ছিল। এই বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা ও তাদের গেরিলা আক্রমণ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

ডিআর কঙ্গো আয়তনের দিক থেকে একটি বড় দেশ। দেশটির দুর্গম ভৌগোলিক পরিবেশ, অস্ত্রপ্রচুর রাস্তাঘাট, জঙ্গল, পাহাড়, সংক্রামক রোগের উপদ্রব, অসামাজিক অসন্তোষ লজিস্টিক ও সাপ্লাই চেইন প্রভৃতি বিষয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শান্তি মিশন পরিচালনা করা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন সক্ষম হয় এবং তাদের এই পেশাদারিত্ব সর্বমহলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। এছাড়াও ডিআর কঙ্গোতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত

লেভেল-২ হাসপাতালে স্থানীয়দের চিকিৎসাসেবা দিয়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটসমূহ দুর্গম জঙ্গলে রাস্তাঘাট নির্মাণ করে এবং ফিমেল কন্টিনজেন্ট নারীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কঙ্গোর এমন ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিশাল ও সম্ভব উপস্থিতি আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের জন্য বিপুল সম্মান বয়ে আনে।

সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তি মিশন (UNAMSIL) এ অংশগ্রহণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়গুলোর একটি। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত চলা এই মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা কে শান্তি মিশনে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ এখনও উদাহরণ হিসেবে দেখে। UNAMSIL মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা, সমঝোতা ও আলোচনার মাধ্যমে বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণে রাজি করা এবং কখনো সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট রক্ষার ক্ষেত্রে জীবনবাজি রেখে কাজ করে। এছাড়াও যুদ্ধবিধ্বস্ত সিয়েরা লিওনে ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ, সরকারি স্থাপনাসমূহ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও খাদ্য ও ওষুধ বিতরণ, চিকিৎসাসেবা, ছোট ছোট স্কুল তৈরি করে বাচ্চাদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি গণমুখী কার্যক্রম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে স্থানীয়দের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

২০০৩ সালে লাইবেরিয়ার জাতিসংঘের শান্তি মিশন আনমিল (UNMIL) শুরু হয়। এই মিশনে বাংলাদেশ অন্যতম শান্তিরক্ষা প্রেরণকারী দেশ। গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত লাইবেরিয়াতে বিদ্রোহীরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও ভারী অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী ছিল। বাংলাদেশের সেনা

সদস্যরা অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে হাজার হাজার সশস্ত্র বিদ্রোহীকে অস্ত্র সমর্পণ করত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এই সফলতা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়। লাইবেরিয়ার বিরূপ পরিবেশ, স্বাস্থ্যঝুঁকিসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট রক্ষায় সফলতা অর্জন করায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পেশাদারিত্বের জন্য 'Reliable and Dedicated' (অসাধারণ ও ঈর্ষণীয়) বাহিনী হিসেবে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন, যা দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে।

এছাড়াও রাস্তাঘাট, এয়ারফিল্ড, ব্রিজ, হেলিপ্যাড তৈরি, স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান, স্থানীয় যুবকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, জেনারেটর রিপেয়ারিং এবং সেলাইয়ের কাজে দক্ষ করে তোলা, স্থানীয়দের চিকিৎসাসহ মানবিক সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ লাইবেরিয়ার সরকার গাবার্ঙ্গী শহরে 'বাংলাদেশ স্কয়ার' নামের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে।

২০১৪ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কন্টিনজেন্ট, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে শান্তিরক্ষা মিশনে গমন করে। বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সেস সদস্যরা জুকাঙ্গো এলাকায় অপারেশন 'পোপু' পরিচালনা করে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের পরাজিত করে সাধারণ জনসাধারণের চলাচলের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। এছাড়াও রাজধানী বাঙ্গুই থেকে ক্যামেরুন সীমান্ত পর্যন্ত ৬১০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি বিদ্রোহীদের অস্ত্রালগ্নে ছিল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই সড়কপথে নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করে; যা বিশ্বদরবারে প্রশংসিত হয়। দুর্গম এলাকায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পেইন ও ওষুধ বিতরণ, স্থানীয়দের জন্য স্কুল নির্মাণ, মসজিদ-মন্দির-গির্জা সংস্কারকরণ, যুবকদের জন্য প্রীতি ম্যাচ আয়োজন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ

বিতরণের ন্যায় সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে স্থানীয় সাধারণ মানুষ মণিকোঠায় স্থান করে নেয়।

জাতিসংঘের মাল্টি ডাইমেনশনাল ইন্টিগ্রেটেড স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন (MINUSMA) ছিল জাতিসংঘের ঝুঁকিপূর্ণ ও জটিল মিশনগুলোর একটি। বিদ্রোহীদের চোরাগোপ্তা হামলা, আইইডি বিস্ফোরণ ও যত্রতত্র মাইনপুঁতে পরিচালনা ছিল শান্তিরক্ষীদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, কৌশলগত ও রাজনৈতিক জটিলতা, ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা মালি মিশনকে জটিল করে তোলে। এই পরিস্থিতেও মধ্যেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে অভিভাবিক সফলতা অর্জন করে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীগণ মানবিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধন সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে স্থানীয়দের মন জয় করতে সক্ষম হয়। এই মিশনে অংশগ্রহণকারী ব্যানারব্যাট-১ তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের বিশেষ সম্মাননা অর্জন করে; যা বিশ্বপরিমণ্ডলে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

জাতিসংঘ শান্তি মিশন পরিচালনাকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বহুমুখী সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে থাকে। সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলের বিপজ্জনক পরিবেশ, অপ্রত্যাশিত হামলা বা আইইডি বিস্ফোরণ অন্যতম। এছাড়া ভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির একটা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ও আস্থার সম্পর্ক স্থাপনও একটা বড় প্রতিকূলতা। এলাকাভিত্তিক রোগের প্রাদুর্ভাবও ক্ষেত্র বিশেষে শান্তিরক্ষীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। মূলত এসব সমস্যা ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগ ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে অত্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

শান্তি রক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের সুবাদে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে, যা কূটনৈতিক সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। বাংলাদেশ একাধিকবার সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের সম্মান অর্জন করে। ২৮ নভেম্বর ২০২৫ সালে জাতিসংঘ তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের কাজের প্রশংসা করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পোস্ট করে। সেখানে বলা হয়, 'বিশ্ব জুড়ে চলা শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ৫৬০০ এর অধিক সামরিক ও পুলিশ কর্মকর্তা 'সার্ভিস ফর পিস'-এ কাজ করছেন। তারা তাদের পরিবারকে পেছনে ফেলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। আমরা এই সাহসী নারী ও পুরুষদের (বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী) সেবা ও ত্যাগের জন্য ধন্যবাদ জানাই।' বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্মান ও গৌরবের।

২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে বিআইপিএসওটি (BIPSOT) পরিদর্শনকালে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির অবদানের প্রশংসাসূচক বক্তব্যে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশকে 'জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনের কেন্দ্রবিন্দু' হিসেবে উল্লেখ করেন। বিআইপিএসওটি (BIPSOT) হলো শান্তি রক্ষা মিশনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের জন্য জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এমন গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ত্যাগের তালিকাও বেশ দীর্ঘ। শুরু থেকে এই পর্যন্ত বিশ্ব শান্তি রক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ১৬৪ জন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষী শহীদ হয়েছেন। অনেকে আহত হয়ে স্থায়ী পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

২০০৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর বেনিন দুর্ঘটনায় দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের ১৫ জন শান্তিরক্ষী শাহাদত বরণ করেন। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা মিশনের সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে ২০০৫ সালে। ডিআর কঙ্গোর সশস্ত্র বিদ্রোহীরা ০১ জন বাংলাদেশি

শান্তিরক্ষীকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং একই মিশনে ২০১৩ সালে আরো ০৩ জন শান্তিরক্ষী শাহাদত বরণ করেন।

সর্বশেষ ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ সুদানের আবেই-এ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ওপর ড্রন আক্রমণ পরিচালনা করে বিরোধী গোষ্ঠী। এই আক্রমণে ছয় জন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুতোভয় শান্তিরক্ষী শাহাদত বরণ করেন।

বিশ্বপরিমণ্ডলে বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শান্তি প্রতিষ্ঠায় দক্ষ একটি বাহিনী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেমন দেশমাতার প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত; তেমনি বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে অকুতোভয়। আর এভাবেই জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় সেনাবাহিনী। এজন্যই বিশ্ব গুণে গুণান্বিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সত্যি কার অর্থেই আমাদের গর্ব, দেশের অহংকার।

লেখক: লে. কর্নেল হাসানুর রহমান, বিজিবিএম, পিএসসি, সেনা কর্মকর্তা